IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মেঘদূতের সৌন্দর্যসমীক্ষা

সুদীপ সরকার,
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ:- কালিদাস রচিত *মেঘদূত* সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য সৌন্দর্যনির্মাণের দৃষ্টান্ত, যেখানে বিরহবেদনা, প্রকৃতি-চিত্রণ ও নান্দনিক কল্পনার অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। এই গবেষণাপত্রে *মেঘদূত* কাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশেষত প্রকৃতি ও মানবিক অনুভূতির অন্তঃসম্পর্ক, অলংকারপ্রয়োগের সূক্ষ্মতা, উপমা ও রূপকের কাব্যিক তাৎপর্য এবং শৃঙ্গাররসের বিরহাত্মক বিকাশের নান্দনিক রূপ এখানে আলোচনার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। গবেষণায় প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, *মেঘদূত* কেবলমাত্র একটি বিরহকাব্য নয়, এটি রস, ভাব ও অলংকারের সুসমন্বয়ে গঠিত এক পরিপূর্ণ কাব্যরূপ, যেখানে প্রকৃতি মানবিক অনুভূতির সহচর ও বাহক হিসেবে উপস্থিত। কালিদাসের কাব্যদৃষ্টিতে প্রকৃতি নিছক বর্ণনার বিষয় নয়, তা মানবমনের আবেগ, স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী প্রকাশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে *মেঘদূত* ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে সৌন্দর্যবোধের এক উচ্চমানের নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে, *মেঘদূত* কাব্যে সৌন্দর্য একটি বিচ্ছিন্ন উপাদান নয়, তা রসতত্ত্ব, অলংকারতত্ত্ব ও মানবিক সংবেদনশীলতার সমন্বিত ফল। যার দ্বারা কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যধারায় এক চিরায়ত নান্দনিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে।

সূচক শব্দ:- সৌন্দর্যতত্ত্ব, প্রকৃতি-চিত্রণ, রস, অলংকার, ধ্বনি।

ভূমিকা:- সৌন্দর্য কী এবং তার স্বরূপ কী? এই প্রশ্নটি ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও সুবিস্তৃত তাত্ত্বিক আলোচনা তুলনামূলকভাবে বিরল। যদিও কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় সৌন্দর্য অনুষঙ্গ হিসেবে বারংবার উপস্থিত হয়েছে, তথাপি সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ণয়ে সুসংহত দার্শনিক বিশ্লেষণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর* গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। পণ্ডিত জগন্নাথ কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন— 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্'।[১] অর্থাৎ যে শব্দ রমণীয় অর্থকে প্রতিপাদন করে, তাকেই কাব্য বলা হয়। এই সংজ্ঞার মাধ্যমে তিনি কাব্যের মূলসত্তাকে রমণীয়তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত করেছেন। তবে লক্ষণীয় যে, কাব্যের সংজ্ঞা প্রদান সত্ত্বেও তিনি রমণীয়তার স্বরূপ নির্ধারণে কোনও বিশদ বিশ্লেষণ আরোপ করেননি। রমণীয়তা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জগন্নাথ বলেছেন— 'লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা'।[২] অর্থাৎ যে জ্ঞান লোকোত্তর আনন্দ উৎপন্ন করে এবং যা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে, তাই রমণীয়। এখানে রমণীয়তাকে তিনি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের

মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং একে লোকোত্তর ও চৈতন্যনির্ভর আনন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। লোকোত্তরতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জগন্নাথ আরও বলেছেন যে, এর কোনও নির্দিষ্ট লক্ষণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এটি কেবলমাত্র স্বানুভবসিদ্ধ— 'লোকোত্তরত্বং চাহ্লাদগতশ্চমৎকারত্বাপরপর্যায়োঽনুভবসাক্ষিকো জাতিবিশেষঃ। কারণং চ তদবচ্ছিন্নে ভাবনাবিশেষঃ পুনঃপুনরনুসন্ধানাত্মা।'[৩] এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে লোকোত্তরতা বা চমৎকারত্ব কোনও বস্তুনিষ্ঠ বা পরিমেয় গুণ নয়। এটি রসগ্রাহীর অন্তর্গত অনুভবের দ্বারা প্রতিভাসিত একটি বিশেষ জাতি, যার উপলব্ধি পুনঃপুন ভাবনানুসন্ধানের মাধ্যমে ঘটে। অতএব রমণীয়তার লক্ষণ বিচার করলে দেখা যায় যে সৌন্দর্য বলতে কী বোঝায় এই বিষয়ে পণ্ডিত জগন্নাথের একটি সুস্পষ্ট ও গভীর ধারণা বিদ্যমান ছিল। তিনি সৌন্দর্যকে মূলত চমৎকারত্বের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখিয়েছেন, যা লোকোত্তর আনন্দজনক এবং অনির্বচনীয় অনুভবসিদ্ধ এক বিশেষ মানসিক অবস্থা। এই চমৎকারত্বই কাব্যরসের প্রাণস্বরূপ এবং কাব্যের নন্দনতাত্ত্বিক সার্থকতার প্রধান মানদণ্ড।

মহাকবি কালিদাস তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও কাব্যদৃষ্টির মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রকৃতি, মানবমন ও সৌন্দর্যতত্ত্ব এই তিনের সুসমন্বয়ে গঠিত তাঁর কাব্যভুবন ভারতীয় সাহিত্য ঐতিহ্যে এক স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কালিদাসের রচনাসম্ভারের মধ্যে *মেঘদূত* একটি গীতিকাব্য হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই কাব্যে ব্যক্তিগত বিরহবেদনা, প্রকৃতির নান্দনিক রূপায়ণ এবং কাব্যিক কল্পনার অপূর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। *মেঘদূত* কাব্যটি পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। কাব্যের মূল কাঠামো নির্মিত হয়েছে এক নির্বাসিত যক্ষের করুণ কাহিনিকে কেন্দ্র করে। যে তার প্রিয়তমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করে বার্তা প্রেরণ করতে চায়। এই কল্পনাপ্রসূত দূতভাবনা কেবল কাব্যিক অভিনবত্বের নিদর্শন নয়, তা মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম ও গভীর রূপায়ণের মাধ্যম। কাব্যের সূচনাশ্লোকেই যক্ষের মানসিক অবস্থা ও কাব্যের মূল আবেগ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—

> কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
> শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।[৪]

এই শ্লোকে দেখা যায়, প্রিয়তমার বিরহবেদনা যক্ষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে সে নিজের কর্তব্যবোধ বিস্মৃত হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রভুর অভিশাপে তার মহিমা লুপ্ত হয়ে সে এক বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছে। এখানে বিরহ কেবল ব্যক্তিগত শোক নয়, তা মানবিক দুর্বলতা, করুণা ও আত্মবিস্মৃতির প্রতীক হিসেবে রূপায়িত। এই সূচনাংশেই কালিদাস কাব্যের রসতাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছেন। যেখানে শৃঙ্গাররস বিরহাত্মক রূপে করুণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এক গভীর নান্দনিক আবহ সৃষ্টি করে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, *মেঘদূত* কেবল একটি বিরহকাব্য নয়, এটি ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের আলোকে এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যনির্মাণ। যেখানে রস, অলংকার, ধ্বনি ও কাব্যিক কল্পনার সামগ্রিক সমন্বয়ে মানবিক অনুভূতির এক চিরায়ত রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১. কাব্যের কাঠামো ও নান্দনিক পরিকল্পনা:- কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য তার নান্দনিক পরিকল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই গীতিকাব্যের মূল বিন্যাস একটি কল্পিত ভ্রমণপথকে কেন্দ্র করে নির্মিত, যেখানে মেঘের যাত্রা কাব্যের গঠনগত মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করার মধ্য দিয়ে কবি কাব্যিক সংহতির এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যার ফলে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতিবর্ণনাগুলি একটি ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করেছে। মেঘের যাত্রাপথে বিভিন্ন জনপদ, নদী, পর্বত, বনভূমি ও নগরের বর্ণনা কাব্যটিকে কেবল ভৌগোলিক বিস্তৃতি প্রদান করেনি, বরং তা যক্ষের অন্তর্লোকের মানসিক যাত্রার প্রতিফলন হিসেবেও কাজ করেছে। প্রকৃতির এই বহুমুখী চিত্রায়ণ একদিকে যেমন দৃশ্যমান সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি বিরহবেদনায় ক্লিষ্ট মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রতীকী রূপ প্রদান করে। ফলে ভ্রমণবর্ণনা কাব্যে একটি দ্বৈত তাৎপর্য অর্জন করেছে। এই ধারাবাহিক ভ্রমণবর্ণনার ফলে পাঠকের মনে এক চলমান চিত্রকল্প নির্মিত হয়। যেখানে একের পর এক দৃশ্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাব্যের সামগ্রিক নান্দনিক আবহকে গভীরতর করে তোলে। কালিদাসের ভাষাশৈলী, উপমা ও রূপকের সূক্ষ্ম প্রয়োগ এই চলমান দৃশ্যাবলিকে প্রাণবন্ত করে তোলে এবং পাঠককে কাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখে। অতএব *মেঘদূতের* কাব্যিক কাঠামো কেবল একটি ভৌগোলিক ভ্রমণের বিবরণ নয়। এটি এক সুপরিকল্পিত নান্দনিক বিন্যাস, যেখানে প্রকৃতি, মানবিক অনুভূতি ও কাব্যিক কল্পনা এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই কাঠামোগত সংহতিই *মেঘদূত* কাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্বকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছে।

২. প্রকৃতি-চিত্রণে সৌন্দর্য:- কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে প্রকৃতি-চিত্রণ নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রধান বাহক হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। এই কাব্যে প্রকৃতি কেবল পটভূমি রচনার উপাদান নয় তা মানবমনের অনুভূতি, বিশেষত বিরহজনিত বেদনা ও শৃঙ্গাররসের বহিঃপ্রকাশের এক কার্যকর মাধ্যম। কবি মেঘের কল্পিত যাত্রাপথের বর্ণনার মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতের বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসরে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতির বহুরূপী সৌন্দর্যকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, বাতাসে ভর করে উত্তরমুখে অগ্রসর হলে প্রথমেই তার দৃষ্টিগোচর হবে সিদ্ধাঙ্গনাদের মুগ্ধ ও চকিত দৃষ্টিবিন্যাস— 'উন্মুখীভির্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ'[৫] যা একদিকে অলৌকিক জগতের ইঙ্গিত বহন করে, অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে অতিলৌকিক সৌন্দর্যের সংযোগ স্থাপন করে। এর পরেই বেতসলতায় পরিপূর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে মেঘ দিগ্গজদের পথ পরিহার করে অগ্রসর হয়— 'স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্'।[৬] পথে উইয়ের ঢিবির শীর্ষে উদ্ভাসিত সপ্তবর্ণ রামধনু এবং মেঘের শ্যামল দেহকে ময়ূরপুচ্ছধারী কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে কবি প্রকৃতিকে পৌরাণিক ও রূপক মাত্রায় উত্তীর্ণ করেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে মেঘ মালভূমিতে উপনীত হয়। যেখানে সদ্য হলকর্ষিত ভূমিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ামাত্রই সুরভির বিস্তার ঘটে— 'সদ্যঃসীরোৎকষণসুরভি'।[৭] এই সৌরভময় পরিবেশে জনপদবধূদের অকপট ও প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মেঘের অভ্যর্থনা মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির এক আন্তরিক ও স্বাভাবিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে। এরপর আসে আম্রকূট পর্বতের প্রসঙ্গ। দাবানল থেকে মেঘ কর্তৃক রক্ষাপ্রাপ্ত এই পর্বত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মেঘকে সাদরে বরণ করে তার শিখরে আসন প্রদান করে— 'বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ'।[৮] এখানে প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় অনুভূতির আরোপ লক্ষণীয়।

আম্রকূট পর্বতের প্রান্তভাগ পাকা আমে ভরা আম্রকাননে পরিবৃত এবং মধ্যভাগে কালো মেঘের অবস্থান অমরমিথুনদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর স্তনের ন্যায় প্রতিভাত হতে পারে—

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥[৯]

এই কল্পনা শৃঙ্গাররসের সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতবহ প্রকাশ। পর্বতের লতানিকুঞ্জ কিরাতবধূদের উপভোগস্থল হিসেবে চিহ্নিত। সেখানে স্বল্প বিশ্রাম গ্রহণ করে মেঘকে পুনরায় যাত্রা শুরু করতে হয়, যা তার জলবর্ষণের ফলে লঘু হয়ে যাওয়ার কারণে দুরূহ নয়।

পরবর্তীতে মেঘ রেবা নদীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয় যাকে 'বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা' বলা হয়েছে এবং যা নর্মদা নামেও পরিচিত। নদীর এঁকেবেঁকে প্রবাহ কবির দৃষ্টিতে হাতির দেহে অঙ্কিত পত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়— 'রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য'।[১০] সেখানে অল্প বর্ষণের পর মেঘ অগ্রসর হয় বনগজের মদধারায় সুবাসিত জম্বূকুঞ্জে, যেখানে সে সামান্য জলপান করে পুনরায় যাত্রা অব্যাহত রাখে। এই পথে বর্ষণের অনুগামী সারঙ্গ ও চাতকের দল মেঘকে পথ নির্দেশ করে যা বর্ষাকালীন প্রকৃতির প্রাণবন্ততার প্রতীক।

কুর্চি ফুলের সৌরভ, নিবিড় বনভূমি ও সজীব প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যাত্রাপথের প্রতিটি পর্বেই সৌন্দর্যের নতুন ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে। এই সৌন্দর্য আস্বাদনে কামী মেঘের যাত্রায় সামান্য বিলম্ব ঘটে। ক্রমে মেঘ দশার্ণ দেশে প্রবেশ করে, যা মালবভূমির পূর্বাঞ্চল। এখানে তার সঙ্গে আগত রাজহংসদের দল কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে। কেতকীর বেড়ায় শুভ্র কুঁড়ির বিকাশ এবং গ্রাম্য বৃক্ষরাজিতে নানা পাখির বাসা বাঁধা ও কলরব এই সমস্ত বর্ণনায় গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক ও সজীব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

দশার্ণ দেশের রাজধানী বিদিশা নগর দিয়ে প্রবাহিত বেত্রবতী নদীকে কবি নদী নয়, বরং নায়িকারূপে কল্পনা করেছেন। তার চঞ্চল তরঙ্গ ভ্রূবিলাসের ন্যায় এবং তীরের কলধ্বনি অব্যক্ত মধুর স্বরের প্রতিরূপ। মেঘ সেই নায়িকার অধরামৃতস্বরূপ জল পান করে তৃপ্তি লাভ করে। বিদিশা অঞ্চলে অবস্থিত নীচৈ পর্বতের কন্দরসমূহ নগরের কামাভিলাষীদের যৌবনলীলার রঙ্গভূমি হিসেবে চিহ্নিত। পাশাপাশি বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির তীরে অবস্থিত উদ্যানসমূহে মালিনীরা পুষ্পচয়ন করে, আর মেঘ তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে ক্লান্তি নিবারণ করে।

এখানে প্রকৃতি কেবল দৃশ্যমান পটভূমি নয় তা মানবিক অনুভূতির প্রতিচ্ছবি ও মানসিক অভিজ্ঞতার সহচর। যক্ষের বিরহবেদনাকে বহন করার জন্য কবি প্রকৃতিকে এক জীবন্ত ও সংবেদনশীল সত্তা হিসেবে রূপায়িত করেছেন। ফলে প্রকৃতি ও মানবমন পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে এক অভিন্ন নান্দনিক সত্তা রচনা করেছে। মেঘের যাত্রাপথে গ্রাম, নগর, বন ও ক্ষেত্রের সৌন্দর্য যক্ষের হৃদয়ে প্রেমের স্মৃতিকে আরও তীব্র করে তোলে। মেঘ যখন গ্রাম, জনপদ, অরণ্য ও ক্ষেত্র অতিক্রম করে, তখন যক্ষের হৃদয় প্রেমে আর্দ্র হয়ে ওঠে এবং সে প্রিয়ার কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে ব্যাকুল হয়। এখানে প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য মানবমনের অন্তর্গত অনুভূতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিটি দৃশ্য যক্ষের স্মৃতি ও আবেগকে প্রভাবিত করেছে, ফলে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে বিরহবেদনাকে তীব্রতর করার এক নান্দনিক মাধ্যম।

কালিদাসের কাব্যদৃষ্টিতে প্রকৃতি কোন নিষ্ক্রিয় উপাদান নয় তা মানবিক আবেগের প্রতিধ্বনি হিসেবে কার্যকর। গ্রাম ও নগরের শান্ত সৌন্দর্য, অরণ্যের নিস্তব্ধতা এবং ক্ষেত্রের বিস্তৃততা যক্ষের মানসিক অবস্থার বিভিন্ন স্তরকে প্রতীকী রূপ প্রদান করে। এই প্রতীকধর্মী

প্রকৃতি-চিত্রণের মাধ্যমে কবি প্রকৃতি ও মানবমনের মধ্যে এক নান্দনিক ঐক্য স্থাপন করেছেন। সুতরাং *মেঘদূত* কাব্যে প্রকৃতি-চিত্রণ কেবল সৌন্দর্যবর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি মানবিক অনুভূতির কাব্যিক রূপায়ণের একটি অপরিহার্য উপাদান। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই কালিদাসের কাব্যপ্রতিভাকে স্বতন্ত্র ও চিরায়ত করে তুলেছে এবং *মেঘদূত* কাব্যকে ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে পরিণত করেছে।

৩. রসতত্ত্ব ও বিরহশৃঙ্গার:- ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের আলোকে *মেঘদূত* কাব্যের প্রধান রস নিঃসন্দেহে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। এই রসের কেন্দ্রে অবস্থান করছে প্রণয়ী যুগলের বিচ্ছেদজনিত মানসিক যন্ত্রণা, স্মৃতি ও প্রত্যাশা যা কাব্যের প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে সঞ্চারিত। কালিদাস এখানে শৃঙ্গাররসকে সংযোগাবস্থার আনন্দের মাধ্যমে নয়, বরং বিরহের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্য দিয়ে রসাত্মক পূর্ণতায় উপনীত করেছেন। যক্ষের বিরহবেদনা কেবল শোকের বহিঃপ্রকাশ নয়, তা স্মৃতিচারণ, কল্পনা ও আশাবাদের মধ্য দিয়ে এক রসানুভূতিতে পরিণত হয়েছে। বিরহ অবস্থাতেও প্রিয়ার সঙ্গে মানসিক সংযোগ স্থাপনের যে আকুল প্রচেষ্টা, সেটিই বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের মূল সঞ্জীবনী। এই প্রসঙ্গে যক্ষের উক্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ—

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ।
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য॥[১১]

এই শ্লোকে যক্ষ মেঘের প্রতি নিবেদন জানায় যে, যদি সে যথাসময়ে প্রিয়ার কাছে তার বার্তা পৌঁছে দেয় এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে বিরহজনিত দুঃখভার কিছুটা হলেও লাঘব হতে পারে। এখানে আকুলতা ও প্রত্যাশা মিলিত হয়ে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের এক সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল রূপ সৃষ্টি করেছে। বিরহজনিত বেদনা তাই নিছক বেদনামাত্র নয়, তা আশার আলোকসঞ্চার দ্বারা রসাত্মক সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, *মেঘদূতে* স্থায়ীভাব হিসেবে 'রতি' বিরহাবস্থায় অবস্থান করলেও তা করুণার সঙ্গে মিশে এক গভীর আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তবে এই করুণা শৃঙ্গাররসকে গ্রাস করতে পারেনি। শৃঙ্গার রসের বিস্তৃত রসপরিসরের মধ্যেই তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে কাব্যে রসসংঘর্ষ নয়, বরং রসসমন্বয়ের এক সূক্ষ্ম নান্দনিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। অতএব *মেঘদূতের* বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদের বেদনা প্রকাশ করে না, তা মানবিক অনুভূতির গভীরতা, স্মৃতি ও প্রত্যাশার নান্দনিক রূপায়ণের মাধ্যমে ভারতীয় রসতত্ত্বের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই রসানুভূতিই কাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্বকে সুসংবদ্ধ ও চিরায়ত করেছে।

৪. অলংকারপ্রয়োগ ও ভাষাশৈলী:- কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে অলংকারপ্রয়োগ ও ভাষাশৈলী সৌন্দর্যনির্মাণের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত। এই কাব্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও অনুপ্রাস অলংকারের সুষম ও স্বাভাবিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কালিদাসের অলংকারবোধ কৃত্রিম অলংকরণে আবদ্ধ নয়, তা কাব্যবস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রসারণ হিসেবে প্রকাশিত। ফলে অলংকার কাব্যে আলংকারিক ভার সৃষ্টি না করে ভাবগত সৌন্দর্যকে অধিকতর দীপ্ত করে তোলে। *মেঘদূতে* বিশেষভাবে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের নান্দনিক ব্যবহার কাব্যের কল্পনাশক্তিকে উন্মোচিত করেছে। যক্ষ মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করলেও নিজের মনেই এই কল্পনার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই আত্মসংলগ্ন প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে কাব্যের নান্দনিক দ্বন্দ্ব ও কাব্যিক সচেতনতা প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত শ্লোকটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ—

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ

সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।।[১২]

এই শ্লোকের মাধ্যমে যক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন ধোঁয়া, আলো, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে গঠিত জড় সত্তা মেঘ কীভাবে দূতের ভূমিকা পালন করতে পারে, যেখানে বার্তা বহন সাধারণত চেতনাসম্পন্ন প্রাণীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই উৎপ্রেক্ষামূলক সংশয় কাব্যের কল্পনাকে খণ্ডন করে না বরং তা কাব্যিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও গভীর করে তোলে। জড় ও চেতন, বাস্তব ও কল্পনার মধ্যবর্তী সীমারেখা এই অলংকারের মাধ্যমে নান্দনিক রূপ লাভ করেছে।

ভাষাশৈলীর দিক থেকেও *মেঘদূত* এক পরিশীলিত ও সংযত সৌন্দর্যের নিদর্শন। কালিদাসের শব্দচয়ন সুকোমল, ছন্দবিন্যাস মাধুর্যমণ্ডিত এবং বাক্যগঠন সাবলীল। তাঁর কাব্যে অনুপ্রাস অলংকারের সূক্ষ্ম প্রয়োগ শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করেছে। আবার উপমা ও রূপকের মাধ্যমে দৃশ্যমান ও অনুভূতিজগতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এই ভাষাগত সংহতিই কাব্যের রসানুভূতিকে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত করেছে। অতএব *মেঘদূতে* অলংকারপ্রয়োগ কেবল কবির শৈল্পিক কুশলতার পরিচয় নয়। তাহল কাব্যের ভাব, রস ও কল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এক নান্দনিক অনুষঙ্গ। এই সমন্বিত অলংকারবোধ ও ভাষাশৈলীর কারণেই *মেঘদূত* সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্বের এক চিরায়ত মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫. মানবিক অনুভূতি ও নান্দনিকতা:- কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম ও গভীর রূপায়ণ নান্দনিক সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিভাত। এই কাব্যে উল্লিখিত যক্ষ ও যক্ষিণীর সম্পর্ক কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়াও সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক কল্যাণচিন্তার মাধ্যমে এক উচ্চতর মানবিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। যক্ষের বিরহবেদনায় প্রিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রতিফলিত হয়েছে, তা কাব্যকে আবেগঘন ও সংবেদনশীল করে তোলে। বিরহাবস্থায় যক্ষের মানসিক বিপর্যয় কেবল ব্যক্তিগত দুঃখ নয় তা মানবমনের এক সার্বজনীন অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি। এই প্রসঙ্গে *মেঘদূত* কাব্যের একটি শ্লোক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ—

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।।[১৩]

এই শ্লোকে বিরহজনিত মানবিক যন্ত্রণার এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। প্রণয়জনিত বিচ্ছেদের ফলে মানুষ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে এবং এমনকি যারা তার আশ্রয়ে আছে, তাদের প্রতিও উদাসীন হয়ে ওঠে। প্রেমের বিরহ যে ব্যক্তিমানসকে কত গভীরভাবে আলোড়িত করে এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের উপর কী প্রভাব ফেলে এই শ্লোকে তারই নান্দনিক ও সার্বজনীন প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কালিদাস মানবিক দুর্বলতাকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখাননি, তিনি সহানুভূতির আলোকে তা উপস্থাপন করেছেন। এই সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিই কাব্যের নান্দনিক মূল্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। বিরহজনিত দুঃখ কেবল করুণার উৎস নয় তা প্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতারই পরিমাপক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। ফলে যক্ষের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা পাঠকের কাছে এক সর্বজনীন মানবিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং একথা বলা যায়, *মেঘদূত* কাব্যে মানবিক অনুভূতি ও নান্দনিকতা পরস্পরের পরিপূরক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান। যক্ষ ও যক্ষিণীর প্রেমে প্রকাশিত বিরহ, উদ্বেগ ও সহমর্মিতা কাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্বকে মানবিক ভিত্তি প্রদান করেছে। এই কারণেই *মেঘদূত* কেবল একটি কাব্য নয়, বরং মানবমনের গভীর অনুভূতির এক চিরায়ত নান্দনিক দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৬. মেঘদূত ও ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব:- আলঙ্কারিক ও রসতাত্ত্বিক বিচারধারার আলোকে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে *মেঘদূত* এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। এই কাব্যে অলংকার ও রস কেবল পৃথক অলঙ্করণমাত্র নয়, বরং তারা একত্রে মিলিত হয়ে কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছে। কালিদাসের কাব্যপ্রতিভা এখানে সেই স্তরে উন্নীত হয়েছে, যেখানে প্রত্যক্ষ বর্ণনার তুলনায় ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিত অধিক কার্যকর হয়ে ওঠে।

আনন্দবর্ধন প্রবর্তিত ধ্বনিসিদ্ধান্তের আলোকে *মেঘদূত* বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্য তার ধ্বনিত অর্থস্তরে নিহিত। শব্দার্থ বা লক্ষণার্থের সীমা অতিক্রম করে এখানে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে রসের উদ্ভব ঘটে। যক্ষের বিরহ, প্রকৃতির নীরব সাড়া, মেঘের মন্থরগতি এই সকল উপাদান প্রত্যক্ষ বর্ণনার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম আবেগময় অর্থ বহন করে এবং পাঠকের অনুভূতিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, *মেঘদূত* মূলত রসধ্বনি নির্ভর কাব্য। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রস এখানে কেবল বর্ণিত হয়েছে তা নয়, বরং পরিবেশ, প্রকৃতি ও কাব্যিক ইঙ্গিতের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ফলে পাঠক কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে নয় অনুভূতির স্তরেও কাব্যের অর্থ গ্রহণ করেছেন। এই ব্যঞ্জনামূলক রসানুভূতিই কাব্যের নান্দনিক উৎকর্ষের মূল কারণ।

অন্যদিকে আলঙ্কারিক তত্ত্বের দৃষ্টিতে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকার *মেঘদূতে* কখনোই বাহ্যিক অলঙ্করণ হিসেবে প্রতিভাত হয় না। এগুলি ধ্বনির সহায়ক হিসেবে কাজ করে রসের ব্যঞ্জনাকে আরও গভীর ও বহুমাত্রিক করে তোলে। এই সমন্বয়ই কালিদাসকে কেবল অলংকারপ্রধান কবি রূপে নয়, ধ্বনিপ্রধান মহাকবি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অতএব বলা যায়, *মেঘদূত* ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এক উৎকৃষ্ট কাব্যিক নিদর্শন, যেখানে অলংকার, রস ও ধ্বনি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সত্তা রূপে মিলিত হয়েছে। আনন্দবর্ধনের ধ্বনিসিদ্ধান্তের আলোকে বিচার করলে এই কাব্য আমাদের সামনে এমন এক সৌন্দর্যরূপ উন্মোচিত করে, যা প্রত্যক্ষ ভাষার সীমা অতিক্রম করে সূক্ষ্ম আবেগ ও গভীর নান্দনিক অনুভূতিতে পর্যবসিত হয়। এই কারণেই *মেঘদূত* চিরকালীন কাব্য হিসেবে স্বীকৃত।

উপসংহার:- উপর্যুক্ত আলোচনার সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রতিপন্ন হয় যে, কালিদাস রচিত *মেঘদূত* সংস্কৃত সাহিত্যে এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যনির্মিত কাব্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই গীতিকাব্যে প্রকৃতি, মানবমন ও কাব্যতত্ত্ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন উপাদান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে এরূপ নয়, তারা একসূত্রে গ্রথিত হয়ে কাব্যের নান্দনিক ঐক্য নির্মাণ করেছে। যক্ষের বিরহবেদনা, প্রকৃতির সজীব রূপায়ণ এবং অলংকার–রস–ধ্বনির সুসমন্বয় কাব্যটিকে এক উচ্চতর সৌন্দর্যস্তরে উন্নীত করেছে।

কালিদাসের কল্পনাশক্তি এখানে নিছক অলীক নয় তা ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির আলোকে রূপায়িত। তাঁর ভাষাশৈলী সংযত অথচ গভীর ব্যঞ্জনাময়, যেখানে প্রত্যক্ষ বর্ণনার চেয়ে ইঙ্গিত ও ধ্বনি অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে *মেঘদূতে* বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রস কেবল বর্ণিত হয়েছে তা নয়, বরং পাঠকের অনুভূতিতে ধ্বনিত হয়ে এক স্থায়ী নান্দনিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে।

এছাড়া এই কাব্যে প্রকৃতি মানবিক অনুভূতির প্রতিচ্ছবি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যা কালিদাসের কাব্যপ্রতিভার এক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি এখানে পটভূমি নয়, বরং মানবমনের সহচর। ফলে কাব্যের সৌন্দর্য কেবল দৃশ্যগত নয়, মানসিক ও আবেগগত স্তরেও বিস্তৃত। এই মানবিক ও নান্দনিক সমন্বয়ই *মেঘদূত*কে কালোত্তীর্ণ কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অতএব বলা যায়, *মেঘদূত* কেবল একটি বিরহকাব্য নয় এটি ভারতীয় সাহিত্য-ঐতিহ্যে সৌন্দর্যতত্ত্বের এক চিরন্তন মানদণ্ড। অলংকার, রস ও ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত এই কাব্য আজও

পাঠক ও গবেষকের নিকট নান্দনিক গভীর চিন্তার এক অপরিসীম ক্ষেত্র উন্মোচিত করে। এই কারণেই *মেঘদূত* ভারতীয় কাব্যধারায় এক অনতিক্রম্য শিখর হিসেবে বিবেচিত।

উল্লেখপঞ্জি:-

১. রসগঙ্গাধর, সম্পা. মধুসূদন শাস্ত্রী, পৃ. ১৩।
২. তদেব, পৃ. ১৪।
৩. *তত্রৈব*
৪. মেঘদূত, পূর্বমেঘ, শ্লোক ১।
৫. তদেব, শ্লোক ১৪।
৬. *তত্রৈব*
৭. তদেব, শ্লোক ১৬।
৮. তদেব, শ্লোক ১৭।
৯. তদেব, শ্লোক ১৮।
১০. তদেব, শ্লোক ১৯।
১১. তদেব, শ্লোক ৭।
১২. তদেব, শ্লোক ৫।
১৩. তদেব, শ্লোক ১০।

Select Bibliography

Ānandavarddhana. *Dhanyāloka.* Ed. Subodh Chandra Sengupta & Kalipada Bhattacharya. Kolkata: Mukherjee & Co. Private Limited, 1364 B. S.
Bharatamuni. *Nāṭyaśāstra* (With Commentary *Abhinavabhāratī*). Ed. M. Ramakrishna Kavi. Baroda: Oriental Institute, 2006.
Bhattacharya, Parvati. *Meghadūta Paricaya*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1339 B. S.
Chakraborty, Satyanarayana. *Meghadūta & Soudāmanī*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2013.
Daṇḍin. *Kāvyādarśa.* Ed. Rangacharya Raddi Shastri. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1938.
Dasgupta, Surendranath. *Soundaryatattva.* Kolkata: Chirayata Publication, 1357 B.S.
Jagannātha. *Rasagaṅgādhara*. Ed. Madhusudan Shashtri. Varanasi: Banaras Hindu University.
Kālidāsa. *Meghadūtam.* Ed. Baidyanath Jha. Varanasi: Krishnadas Academy, 2002.
Ibid. (With Commentary *Meghaprabhā*). Ed. Gurunath Vidyanidhi Bhattacharya & Kalipada Tarkacharya. Kolkata: Student Library, 1934 B. S.